সমৃদ্ধ জীবন ও রাষ্ট্রদর্শনের স্বত্বাধিকারী আল-ফারাবি

ড. আমিনুল ইসলাম

গ্রিক দর্শনের যুক্তিবাদী ঐতিহ্যের আদলে মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক চিন্তায় যারা একটি গৌরবোজ্জ্বল ধারা রচনা করেন তারা ফালাসিফা (দার্শনিক) নামে সুপরিচিত। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তাদের অবদান কেবল মুসলিম জাহানেই নয়, প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় বলয়েই স্বীকৃত ও নন্দিত। এর প্রধান কারণ, গ্রীক দর্শনের বুদ্ধিবাদী হাতিয়ার ও কলাকৌশল ব্যবহার করে তারা ধর্মবিশ্বাস খণ্ডন করতে চাননি, চেয়েছেন অনাবিল বিশ্বাসকে সুদৃঢ় যৌক্তিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে।

এই ফালাসিফা সম্প্রদায়ের প্রথম দার্শনিক ছিলেন আল কিন্দি (৮০১-৮৭৩)। তার পরবর্তী বিশিষ্ট দার্শনিক আল-ফারাবি (৮৭০-৯৫০)। বিশুদ্ধ দর্শন ছাড়াও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, যুক্তিবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ফারাবির অবদান অপরিমেয়। তার মতে, দর্শন অধ্যয়নের প্রস্তুতি হিসেবে অবশ্যই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, গণিত ও লজিক পাঠ করা উচিত। কারণ, তাতে করে মানুষ ঐন্দ্রিয়িক পর্যায় থেকে সহজেই বৌদ্ধিক পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। বিশেষ করে যুক্তিবিদ্যায় (লজিক) এমন এক ধরনের কলাকৌশল পাওয়া যায় যার প্রয়োগ ও অনুশীলনে মানুষ ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকতে এবং সত্যের সন্ধান পেতে পারে। শুরু থেকে সিদ্ধান্ত পর্যন্ত কী করে চিন্তন প্রক্রিয়াকে চালিত করতে হয়, মিথ্যা থেকে কীভাবে সত্যকে ফারাক করতে হয় প্রভৃতি বিষয়ে মানুষকে অবহিত ও আলোকিত করাই যুক্তিবিদ্যার মূল কাজ। ভাষা ও ব্যাকরণ না জেনে শুধু কিছু কবিতা মুখস্থ করে যেমন বড় কিছু করা যায় না, তেমনি আলঙ্কারিক কিংবা কূটতার্কিক চিন্তার বিচ্ছিন্ন প্রয়োগ দ্বারাও যুক্তিবিদ হওয়া যায় না।

দর্শন বলতে ফারাবি কিছু বিচ্ছিন্ন বিষয়ের নিছক সমষ্টিকে বোঝেননি, বুঝেছেন একটি একক সমগ্র (উমবযরণদণভ্রধশণ) বিষয়কে। সত্যের অনুসন্ধান ও অনুশীলন এবং জরাজীর্ণ কুসংস্কার বর্জনই যথার্থ দার্শনিকের লক্ষ্য। সত্যনিষ্ঠ ও আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন দার্শনিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অপরীক্ষিত বিশ্বাস নয়, যৌক্তিক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়েই দার্শনিক সক্ষম হন সম্যক জ্ঞান ও পরমসত্তার সান্নিধ্য অর্জনে। পদ্ধতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও ধর্ম ও দর্শন উভয়েরই লক্ষ্যই এক। আল-ফারাবি দর্শনকে দেখেছেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির দৃষ্টিতে এবং ধর্মকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন যুক্তিবাদী দার্শনিকের অবস্থান থেকে। আইন বিজ্ঞানকেও তিনি যুক্ত করতে চেয়েছেন ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে। এজন্যই আইন বিজ্ঞানকে তিনি বর্ণনা করেছেন সঠিক ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণের এমন একটি ক্ষেত্র ও কলকৌশল হিসেবে যার সম্পর্কে আইনদাতা আল্লাহ ছিলেন নিশ্চুপ। ফারাবির মতে, ধর্মতত্ত্ব বলতে বোঝায় আইন বিজ্ঞানে বিধৃত বিশ্বাস ও আচরণ সমর্থনের এবং তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যুক্তি ও সংশয় খণ্ডনের কলাকৌশলকে। আইন বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্বের পার্থক্য এখানে যে, প্রথমটি যেখানে শাস্ত্রীয় হেতুবাক্য থেকে সিদ্ধান্ত নিঃসৃত করে, দ্বিতীয়টি সেখানে সেসব হেতুবাক্য সমর্থন করে হয় শাস্ত্রীয় বিধানের মাধ্যমে কিংবা অভিজ্ঞতা প্রথা অথবা বুদ্ধির মৌল নীতির আলোকে। এসব নীতির সঙ্গে যখনই শাস্ত্রীয় বিধানের বিরোধ দেখা দেয়, তখনই শাস্ত্রকে ব্যাখ্যা করতে হবে রূপক অর্থে। তা যদি অসম্ভব প্রমাণিত হয়, তাহলে প্রথা বা বুদ্ধির তথাকথিত নীতিমালাকে ভ্রান্ত বলে এমনভাবে বাদ দিতে হবে যেন শাস্ত্রের কর্তৃত্বকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করা যায়। এ ব্যাপারে শাস্ত্র-সমর্থকদের পক্ষে প্রয়োজনবোধে মিথ্যাচার, বাগাড়ম্বর কিংবা চালাকির আশ্রয় নিয়ে হলেও তাদের প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করা উচিত।

মানবাত্মার অমরত্ব বিষয়ে আল-ফারাবির সঠিক মত যে কী ছিল, তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। কারণ, তার রচনার বিভিন্ন স্থানে অমরত্বের পক্ষে যেমন, বিপক্ষেও তেমনি যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, তার মতে মৃত্যুতে দেহবিনাশের পর যা টিকে থাকে তা হলো সক্রিয় বুদ্ধি। এই সক্রিয় বুদ্ধি মানবাত্মার নিজস্ব কোনো বৃত্তি নয়, একটি নৈর্ব্যক্তিক নীতি। সুতরাং এ থেকে যে অমরত্বের আভাস পাওয়া যায়, তা বড়জোর যৌথ

অমরত্ব হতে পারে, ব্যক্তিগত অমরত্ব নয়।

তবে আল-ফারাবির রচনায় এমন অনেক মন্তব্যও পাওয়া যায় যেখানে পারলৌকিক শান্তির কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। বিশেষত, আদর্শ নগরী (আল-মদিনাহ আর-ফাদিলাহ) গ্রন্থে তিনি পরলোকে আত্মাকে সুখী করাই মানুষের পার্থিব প্রয়াসের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছেন। ফারাবির মতে, মানুষের যথার্থ সুখ নিহিত সক্রিয় বুদ্ধির অজড়ীয় স্বরূপের অংশীদারিত্বে। আর এ জীবনে যে ব্যক্তি সেই স্বরূপের যত বেশী অংশীদার হবে, পরলোকে তার আত্মা অর্জন করবে তত বেশী অজড়ত্ব, তত বেশী সুখ। পরলোকে আত্মা যে সুখলাভ করবে, তা সর্বত্র একরকম কিংবা অভিন্ন নয়। কারণ, প্রত্যেক আত্মার স্বরূপ নির্ভরশীল সেই দেহের ওপর, পার্থিব জীবনে যা ছিল তার আশ্রয়ে। আর একথাও স্পষ্ট যে, মেজাজ গঠন প্রকৃতি প্রভৃতি দিক দিয়ে বিভিন্ন দেহের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। ফলে আত্মার ভাগ্য ও সুখের পরিমাণ নির্ভর করবে সেই দেহের অবস্থার ওপর, যার সঙ্গে তা যুক্ত ছিল পার্থিব জীবনে। তবে সুখের ভাগ্য নির্দিষ্ট থাকবে কেবলমাত্র সদগুণসম্পন্ন আত্মা, তথা মহৎ নগরীর অধিবাসীদের জন্য। পার্থিব জীবনে স্থূল দৈহিক ভোগবিলাসে মগ্ন ছিল বলে দুর্নীতিগ্রস্ত নগরীর অধিবাসীরা কখনো দেহের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে না। বরঞ্চ তাদের আত্মা একের পর এক জড়ীয় অবস্থায় আবির্ভূত হতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা অধঃপতিত হবে পাশবিক পর্যায়ে। সেই সঙ্গে তারা বিনষ্ট হয়ে যাবে সমূলে।

আল-ফারাবির দার্শনিক অবদান ধর্মতত্ত্ব (কদণমফমথহ), অধিবিদ্যা (ৃর্ণটযদত্র্রধদ্র), নীতিবিদ্যা (ঋদধদ্র) প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে বিস্তৃত। তবে রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে তার কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এখানে তার দার্শনিক ও দিশারী ছিলেন প্লেটো। প্লেটো তার সুপ্রসিদ্ধ রিপাবলিক গ্রন্থে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের এক চিত্তাকর্ষক চিত্র অঙ্কন করেছেন। তার মতে, মানুষ একদিকে যদিও একজন ব্যক্তিবিশেষ, অন্যদিকে আবার একটি সামাজিক সত্তাও বটে। প্লেটোর এ ধারণার আলোকেই আল-ফারাবি রচনা করেছেন তার রাষ্ট্র দর্শনের রূপরেখা, ব্যাখ্যা করেছেন ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধ। ফারাবি দর্শনে একই সঙ্গে আবার লক্ষ্য করা যায় স্টোয়িক মতের প্রভাব। স্টোয়িকবাদের বেলায় যেমন, ফারাবির চিন্তায়ও তেমনি জগৎ মানুষকে শুধু একটি অংশ হিসেবেই অন্তর্ভুক্ত করে না, একাধারে নিজেকে প্রতিবিম্বিত ও অভিব্যক্ত করে মানুষেরই মাধ্যমে। জগৎ ও মানুষের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধকে আল-ফারাবি দেখাবার চেষ্টা করেছেন অধিবিদ্যা ও রাষ্ট্রদর্শনের সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে এবং একইভাবে তিনি আবার বিবৃত করতে চেয়েছেন স্রষ্টা ও জগতের সঙ্গে মানুষের এবং এক ব্যক্তির সঙ্গে অপরাপর ব্যক্তির সম্বন্ধকে।

তাই ফারাবির মতে, আমরা যাকে রাষ্ট্রদর্শন ও নীতিবিদ্যা বলি, তা অধিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্বেরই সম্প্রসারণ। এজনই দেখা যায় যে, পবিত্র নগরীর অধিবাসীদের অভিমত (ৃযধভধমভ্র মত´দণ অভদটঠর্ধটর্ভ্র মত´দণ গধর্রলমল্র উর্ধহ) নামক গ্রন্থটিকে তিনি প্লেটোর রিপাবলিকের মতো ন্যায়পরতা এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ আলোচনার মধ্য দিয়ে শুরু না করে শুরু করেছেন আদিসত্তার স্বরূপ, গুণাবলী ও সৃষ্টিক্রিয়ার আলোচনা দিয়ে। ফারাবির মতে, জ্ঞানতাত্ত্বিক, বিশ্বতাত্ত্বিক অধিবিদ্যক–এ তিনটি প্রধান দিক ছাড়াও নৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বলে বুদ্ধির দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। এই শেষোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকেই ফারাবি বুদ্ধিকে অভিহিত করেছেন আনন্দের সেই চূড়ান্ত পথ ও উপায় বলে, যার লক্ষ্য অজড়ীয় সক্রিয় বুদ্ধির পর্যায়ে উপনীত হওয়া। এ পর্যায়ে উপনীত হতে হলে ঐচ্ছিক, বৌদ্ধিক ও দৈহিক–এ তিন ধরনের ক্রিয়া আবশ্যক। এ তিন ক্রিয়ার পাশাপাশি রয়েছে যথাক্রমে নৈতিক, বৌদ্ধিক, শৈল্পিক–এ তিনটি ভার্স্যু বা সদগুণ। বৌদ্ধিক সদগুণ জ্ঞানবৃত্তির উৎকর্ষস্বরূপ। জ্ঞানবৃত্তির কাজ হলো বিভিন্ন ধরনের সত্তার জ্ঞান সংগ্রহ করা। আর সেই জ্ঞানের শীর্ষে রয়েছে সব সত্তার আদিনীতি বা আল্লাহর জ্ঞান। এ বৃত্তির একটি আনুষঙ্গিক দিক হলো বিচার বা অবধারণ (লিঢথবণর্ভ) করার ক্ষমতা। যেকোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে উপযোগী ও কল্যাণকর পন্থা বা বিষয় নির্বাচনই এর কাজ।

শুভ ও উপযোগী কর্মপন্থা নির্বাচন ছাড়া ব্যবহারিক সদগুণ আরো যে জিনিসটি করে থাকে, তাহলো নির্ণীত কর্মপন্থাকে বাস্তবে পরিণত করা। এখন ইচ্ছাযুক্তির নির্দেশনা মেনে চলে। যেহেতু বিশেষ বিশেষ প্রবণতা বা দক্ষতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, সে কারণেই কোনো কোনো ব্যক্তি কোনো কোনো কর্মে এবং সেসব কর্মের সঙ্গে যুক্ত সদগুণে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে থাকে। আর অন্যেরা অনুরূপ দক্ষতা অর্জন করে অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে। মানুষ তার স্বভাব এবং অভ্যাস উভয়টি দ্বারাই বাধ্য হয় শাসক কিংবা শাসিত হতে।

এ বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার কারণে একই রাষ্ট্রে উদ্ভব ঘটে বিভিন্ন শ্রেণীর। এসব শ্রেণী সংগঠনের উদ্ভবের মূলে রয়েছে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার প্রচেষ্টা। আর মানুষ তার কোনো মৌল প্রয়োজনই মেটাতে পারে না তার চারপাশের অন্যান্য মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে। রাষ্ট্র মানুষের দেহের অনুরূপ। মানবদেহে যেমন রয়েছে হৃৎপিণ্ড ও অনেক সহকারী অঙ্গ, তেমনি রাষ্ট্রেরও থাকা চাই যথাক্রমে একজন শাসক ও তার সহযোগী বহু কর্মকর্তা। বৌদ্ধিক ও ব্যবহারিক সদগুণের দিক দিয়ে শাসককে অবশ্যই অন্য সকলকে অতিক্রম করে যেতে হবে। আল্লাহ প্রদত্ত নেতৃত্বগুণ ছাড়াও তাকে প্লেটোর দার্শনিক রাজার মতো বুদ্ধি, প্রখর স্মরণশক্তি, মনের তীক্ষ্ণতা, জ্ঞানানুরাগ, খাদ্য-পানীয়ের ব্যাপারে সংযম, সত্যবাদিতার প্রতি অনুরাগ, মহত্ত্ব ও মিতব্যয়িতা, ন্যায়ানুরাগ, দৃঢ়তা, সৎসাহস, দৈহিক সুস্থতা ও স্বচ্ছতা প্রভৃতি মহৎ গুণের অধিকারী হতে হবে।

ফারাবির মতে, শাসকের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও প্রশাসনিক ক্ষমতার ওপরই নির্ভর করে রাষ্ট্রের ব্যাপক ও স্থায়ী কল্যাণ। শাসক যদি অনুপযুক্ত বা উচ্ছৃঙ্খল হন, তাহলে রাষ্ট্রের শান্তি ও প্রগতির কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এ জন্যই প্লেটোর ন্যায় ফারাবির প্রস্তাব। ব্যাপক রাষ্ট্রীয় কল্যাণ এবং জনগণের শান্তি ও প্রগতির পথ সুগম করতে হলে রাষ্ট্রের শাসনভার অর্পণ করতে হবে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্র দার্শনিকদের ওপর। ধর্মের মূলনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আনুগত্যসম্পন্ন দার্শনিক-শাসকের উপযুক্ত শাসন ব্যবস্থায়ই সম্ভব রাষ্ট্রের যথার্থ কল্যাণ, জনগণের বৈষয়িক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অগ্রগতি।

ন্যায়পরতা বলতে ফারাবি বুঝেছেন অভিন্নভাবে স্বীকৃত কল্যাণের বিলি-বন্টন বা সংরক্ষণকে। কল্যাণ বলতে তিনি স্পষ্টতই বুঝেছেন নিরাপত্তা, সম্পদ, মর্যাদা ও বস্তুগত মালিকানাকে। একই সঙ্গে তিনি ন্যায়পরতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন হৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার এবং অপরকে ইচ্ছাকৃতভাবে বঞ্চিত বা নিঃস্ব করার প্রক্রিয়ায় যে ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সমপরিমাণ শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থাকে। ন্যায়পরতা সম্পর্কে এর চেয়ে আরো ঢালাও ধারণা হলো– ‘চারদিকের মানুষকে সদগুণ প্রদান।’ ন্যায়পরতা সম্পর্কে ফারাবির এ ধারণা প্লেটোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্লেটো ন্যায়পরতাকে বর্ণনা করেছেন আত্মার বিভিন্ন বৃত্তির এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বলে। এই সদগুণ অর্জন ও প্রয়োগের জন্য রাষ্ট্রে আবশ্যিক হয়ে পড়ে শ্রমবিভাজন। আর শ্রমবিভাজন আবশ্যিক হয়ে পড়ে যেসব ব্যক্তি নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত, তাদের স্বাভাবিক দক্ষতার তারতম্যের কারণে।

রাজ্যজয় বা প্রাধান্য বিস্তারকে যারা চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে মনে করেন, ন্যায়পরতা সম্পর্কে এই ধারণা তাদের দেয়া প্রাকৃতিক ন্যায়পরতার ধারণার বিপরীত। এ মতের প্রতি পরোক্ষ কটাক্ষ করে ফারাবি বলেন, যুদ্ধকে যুক্তিযুক্ত বলা যায় কেবল তখনই, যখন তা আক্রমণ প্রতিহত করার কিংবা রাষ্ট্রের অন্য কোনো মহৎ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়, ভূখণ্ড বিজয়ের বা অন্য কোনো লাভের আশায় পরিচালিত হলে নয়।

রাষ্ট্রকে ফারাবি কতকগুলো বিমূর্ত উদ্দেশ্যবাদী নীতির ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত করেছেন। মহৎ রাষ্ট্র বলতে তিনি বুঝেছেন এমন রাষ্ট্রকে যেখানে শুভ বা আনন্দময় জীবনের চর্চা করা হয় এবং যেখানে গুণীব্যক্তি তার যথাযোগ্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তবে এমন রাষ্ট্রও থাকতে পারে, যেখানে জীবনের নিছক প্রয়োজনীয় জিনিস অর্জনের বাইরে অন্য কোনো লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা অনুপস্থিত। কোনো কোনো রাষ্ট্রের রাজা ও তার অনুচরেরা হয় সদগুণ অথবা সম্পদ কিংবা দেশ বিজয়ের মাধ্যমে গৌরব বা সম্মান অর্জনে প্রয়াসী। আবার কোনো কোনো রাষ্ট্রে সম্পদ, আনন্দ ও সম্মান, এদের সবগুলোর সংমিশ্রণকে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে মনে করা হয়। এখানে এক রাষ্ট্রকে অন্য রাষ্ট্র থেকে এবং সাধারণ রাষ্ট্রকে মহৎ রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যের ভিত্তিতে। আবার রাষ্ট্র কীভাবে দুর্নীতি ও পতনের দিকে ধাবিত হয় তার ভিত্তিতেও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে পার্থক্য করা যায়। এদিক থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রকে ফারাবি বর্ণনা করেছেন এমন বিরুদ্ধ রাষ্ট্র বলে যেখানে মহৎ রাষ্ট্রের মৌলিক গুণ, অর্থাৎ সামঞ্জস্য বিঘ্নিত এবং আনন্দের নীতি মর্মান্তিকভাবে দূষিত ও উপেক্ষিত।

ফারাবি চার রকম দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রের বিবরণ দিয়েছেন। এদের তিনি অভিহিত করেছেন অজ্ঞাত নগরী, একগুঁয়ে নগরী, স্বধর্মত্যাগী নগরী এবং ভ্রান্তিকর নগরী বলে। অজ্ঞতার নগরীকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এমন একটি নগরী হিসেবে যার অধিবাসীরা যথার্থ সুখ দেখেনি, সুখের অনুসন্ধানও করেনি; কিন্তু প্রলুব্ধ হয়েছে রকমারি ভ্রান্ত সুখের প্রলোভন দ্বারা। একগুঁয়ে নগরী মহৎ নগরী থেকে স্বতন্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়ে। এর অধিবাসীরা আল্লাহ, মরণোত্তর জীবন এবং যথার্থ সুখের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা করেছে বটে; কিন্তু সেইমতে

জীবন পরিচালিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। অপরদিকে স্বধর্মত্যাগী নগরী হলো সেটি, যেটি প্রথমে আলোচ্য আদর্শ ও মানদণ্ডমাফিক কাজ করলেও পরবর্তীকালে সে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। ভ্রান্তিকর নগরী বলতে ফারাবি বুঝেছেন সেই নগরীকে, যা আল্লাহর ভ্রান্ত জ্ঞান ছাড়া সঠিক জ্ঞান ও যথার্থ সুখ কোনো দিন অর্জন করতে পারেনি এবং যা বার বার এমন এক তথাকথিত নবী দ্বারা শাসিত হয়েছে, যিনি নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়েছেন।

❑ লেখক : সুপারনিউমেরারি প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আদর্শিক চর্চার অভাব দুর্বল করছে বিএনপিকে

মোহাম্মদ আবদুল অদুদ

ওয়ান-ইলেভেনের প্রভাব বিএনপির উপর তুলনামূলকভাবে বেশি পড়লেও, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও তারা তা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। মহাজোটের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ অভাবনীয় আসন বিজয়ের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হয়ে সংসদে ও সংসদের বাইরে সরকার ও দল পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক কিছু গুছিয়ে উঠলেও প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিএনপির তৎপরতা চোখে পড়ার মত নয়।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির ১৫টি সদস্য পদ থাকলেও বর্তমানে আছে ৭/৮টি। কে এম ওবায়দুর রহমান ও এম সাইফুর রহমানের মৃত্যু, এম এ মতিন ও ড. আর এ গনির অসুস্থতা, বি চৌধুরীর পদত্যাগ, আবদুল মান্নান ভূঁইয়া ও তানভীর আহমদ সিদ্দিকীর বহিষ্কারের কারণে স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠনের প্রস্তাব এলেও তা করা হচ্ছে না। মধ্যম সারির নেতারা ভরসা পাচ্ছে না সংগঠনের কোন সঙ্কটকালে কোন স্থায়ী কমিটি সদস্যের কাছ থেকে। তারা সব কিছুতেই চেয়ারপারসনকে দেখিয়ে দেয় বলে অভিযোগ যুগ্ম সম্পাদক গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের। আবার স্থায়ী কমিটিতে ৭টি পদ (স্থায়ী অসুস্থ ২জনসহ) শূন্য হলেও কেন তা পূরণ করে দলকে গতিশীল করা হচ্ছে না, সেই কারণও অজানাই থেকে যাচ্ছে।

এদিকে খোকা-আব্বাসের দ্বন্দ্বে হতাশ ঢাকা মহানগরীর নেতাকর্মীরা। সিটি মেয়র নানা কারণে বিতর্কিত হলেও দলে সমর্থনের মাত্রা তার পক্ষেই বেশি। অপরদিকে সাবেক মেয়র মীর্জা আব্বাসকে ঢাকা মহানগরীর আহ্বায়ক না করলে তার সমর্থক নেতা-কর্মীদের নিষ্ক্রিয় হওয়ার আশঙ্কা করছেন বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন। ফলে দু'জনকে বাদ দিয়ে তৃতীয় আরেক জনকে আহ্বায়ক করে কাউন্সিলের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নভাবে নেতৃত্ব বাছাইয়ের প্রস্তাব করছেন কেউ কেউ। সেনা প্রত্যাহার ইস্যু, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বিডিআর ট্র্যাজেডি, এশিয়ান হাইওয়ে, টিপাইমুখ বাঁধ ও সর্বশেষ আবদুল জলিল ইস্যুতে দেশবাসী কর্মসূচি আশা করছিলো, সেখানে বিএনপি মহাসচিব ও অন্যান্যদের প্রেস ব্রিফিংসর্বস্ব কিছু কর্মকাণ্ড দিয়ে ক্ষমতায় আসার সংগ্রামী পথ পাড়ি দেয়া অসম্ভব হবে বলেই মনে হচ্ছে। বিএনপি সামনের সারিতে আসন বাড়ানোসহ নানা কারণ দেখিয়ে সংসদে যাচ্ছে না। এসব কারণ দেশবাসীর নিকটও যে গ্রহণযোগ্য তেমন মনে হচ্ছে না।

ক'দিন আগে বিএনপি সমর্থক একটি জাতীয় দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় খবর বেরিয়েছে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে বিএনপির পুনর্গঠন কাজ বার বার পিছিয়ে যাচ্ছে। এতে জেলায় জেলায় ক্ষোভের মাত্রা বাড়ছে। একাধিক জেলায় বিক্ষোভ মিছিল, কুশপুত্তলিকা দাহ, এমনকি সংঘর্ষ ও হত্যাকাণ্ডের মত ঘটনাও ঘটছে। এতে কাউন্সিল অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ওই রিপোর্টে অন্তত ২০টি জেলার নানা ক্ষোভ-বিক্ষোভের চিত্র তুলে ধরা হয় এবং উল্লেখ করা হয় বিএনপি মহাসচিবের একটি দায়িত্বহীন ও হাস্যকর উক্তি। তিনি এ কোন্দলের জন্য সরকার ও সরকারী দলের নেতাদের দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আসলে তারা চায় না বিএনপি যথাসময়ে কাউন্সিল করুক।' এটা কি বিএনপির মত একটি সংগঠনের মহাসচিবের বক্তব্য হল? এটা একদম স্বাভাবিক কথা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসাবে আওয়ামী লীগ নেতারা চাইবে বিএনপিতে এবং বিএনপি নেতারা চাইবে আওয়ামী লীগে আভ্যন্তরীণ কোন্দল থাকুক যেন মাঝে মাঝে হাততালি দেয়া যায়।

ডিসেম্বরের মধ্যে তৃণমূল পর্যায় অর্থাৎ ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলার কাউন্সিল সম্পন্ন করে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল করার ব্যাপারে চেয়ারপার্সনের নির্দেশনা থাকায় নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হলেও তা শেষ পর্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে বিএনপি নেতাদের কর্মকাণ্ডে আপাতত তা বোঝা যাচ্ছে না।

যে কোন কর্মসূচীতে চেয়ারপার্সন ও মহাসচিবের আশপাশে তুলনামূলকভাবে জুনিয়র নেতৃবৃন্দ ও নবাগতদেরই দেখা যায় বেশি। কেন্দ্রীয় কমিটির বেশিরভাগ নেতাদের মধ্যেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে মান-অভিমান। 'অমুক থাকলে আমি নাই' এমন নীতির কারণে সারাদেশের নেতাকর্মীদের মধ্যে যে পরিমাণ আগ্রহ উচ্ছ্বাস থাকার কথা সেটাতেও ভাটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছাত্রদের স্থান দেয়ার বিষয়টি এখনও নিশ্চিত হয়নি। আবদুল জলিলের কারণে আওয়ামী লীগ যেমন বিব্রতবোধ করে, ক'দিন পর পর সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর বক্তব্যে বিএনপিও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। সিলেটে এম সাইফুর রহমানের মৃত্যুতে ইলিয়াস আলীর সাথে অন্য নেতাদের দ্বন্দ্ব চরমে ওঠায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিএনপি। প্রতিটি জেলায় নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দল, অধিকাংশ নেতার বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দায়ের করা দুর্নীতির মামলা, তার উপর আওয়ামী লীগ নেতাদের ক্ষমতার প্রভাব প্রভৃতি কারণে বিএনপির কর্মকাণ্ড গতিশীল হচ্ছে না।

কিন্তু একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বিপর্যয়কর পারিবারিক অবস্থার মধ্যেও দলের হাল ছেড়ে দেননি। তিনি নিয়মিত অফিস করছেন এবং সারাদেশের নেতাকর্মীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিচ্ছেন। তবে একাই তো তিনি সব করতে পারবেন না, করা সম্ভবও না। তিনি তার স্থায়ী কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটিকে সক্রিয় করে সারাদেশে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারলে আগামীতে বিএনপির সুদিন দেখা যেতে পারে।

খালেদা জিয়া একান্তভাবে বিএনপিতে সংস্কারপন্থী বলে ভেদ রেখা মুছে ফেলতে চাইছেন। কিন্তু তাকে ঘিরে রাখা কতিপয় নেতার হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়ে সংস্কারপন্থীরা বিশেষ কোনো প্রোগ্রাম ছাড়া দলীয় অফিসে আসেন না। বিএনপি'র মূল সমস্যা আদর্শিক চর্চা দলের মধ্যে না থাকা। এর ফলে নেতা-কর্মীদের মাঝে ত্যাগের মানসিকতা উঠে গেছে। আদর্শিক চর্চা না থাকায় স্বার্থ কেন্দ্রিকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে প্রবলভাবে। এই স্বার্থপরতা ও স্বার্থকেন্দ্রিক রাজনীতিই বিএনপি'র দুর্বলতার মূল কারণ বলে মনে করেন অভিজ্ঞ মহল।

❑ লেখক : সাংবাদিক

৬০ বছর পূর্তিতে চীনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

আহমেদ জামিল

বাংলাদেশের রাজনীতি জগতের পুরোধা ব্যক্তিত্ব মরহুম মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান '৬০-এর দশকে তার প্রথম গণচীন সফরের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, চীনে তার কাছে যেটি দেখে সবচাইতে ভাল লেগেছে তা হল সর্বত্র মানুষের মুখে হাসির ছোঁয়া। একমাত্র সুখী ও সমৃদ্ধশালী জাতির চেহারায় হাস্যোজ্জ্বলভাব সব সময় থাকে। প্রয়াত মাওসেতুং থেকে শুরু করে বর্তমানের হু জিনতাও-এর আমলে চীনা জনগণের সেই প্রাণ থেকে উৎসারিত হাসি অমলিন রয়ে গেছে। গণচীনের জনগণের এই সুখী-সমৃদ্ধশালী জীবন প্রতিষ্ঠিত করেছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই সমাজতন্ত্র গণচীনের জনগণের ভাগ্যেরই শুধু পরিবর্তন ঘটায়নি, দেশকে অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রেও ঈর্ষণীয় সাফল্য এনে দিয়েছে।

৯৫ লাখ ৯৬ হাজার ৯৬০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ১২৯ কোটি ৮৮ লাখ ৪৭ হাজার ৬২৪ জনসংখ্যার বিভিন্ন জাতিসত্তা নিয়ে গঠিত বিশাল দেশ চীন তার রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদীদের সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়ে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বও রক্ষা করে চলেছে।

আবারো বলা হচ্ছে, এই কঠিন কাজটি সম্ভব হয়েছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে। গত ১ অক্টোবর ছিল গণচীনের ৬০তম জাতীয় দিবস। এ প্রেক্ষাপটে এই দিনে ৬০ বছর আগে যে তিয়েন আনমেন স্কোয়ার থেকে সমাজতান্ত্রিক চীনের প্রতিষ্ঠাতা মহান নেতা ও শিক্ষাগুরু চেয়ারম্যান মাও সেতুং সমাজতান্ত্রিক চীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছিলেন, আর সেখানেই দাঁড়ায় চীনা কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান চেয়ারম্যান এবং প্রেসিডেন্ট হু জিতাও চীনের পুনর্জন্মের উচ্চ প্রশংসা করে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন 'একমাত্র সমাজতন্ত্রই পারে চীনকে রক্ষা করতে'।

চীনা বিপ্লব তথা চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে চীন ছিল একটি আধা ঔপনিবেশিক এবং সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র। একটা কথা মনে রাখতে হবে, চীনা বিপ্লবের প্রাথমিক সূচনা কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ঘটেনি। চীনের ছাত্রসমাজ এর সূচনা করেছিল। যে কারণে আধুনিক চীনের ইতিহাসে ১৯১৯ সালের ৪ মে'র আন্দোলনকেই চীনের বিপ্লবের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পিকিং (বর্তমান বেইজিং)-এর ছাত্রদের এই আন্দোলন ছিল সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন। প্রথম মহাযুদ্ধের বিজয়ীপক্ষ, অর্থাৎ ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান ও ইতালী ওই বছরের শুরুতে প্যারিসে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে স্থির করে যে, চীনের সান্টুং প্রদেশে জার্মানী যেসব সুযোগ-সুবিধা পেত, জাপান তা করায়ত্ত করবে।

এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে পিকিং-এর ছাত্ররা সভা এবং মিছিল করে। এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য উত্তর চীনের সমরনায়কদের সরকার ত্রিশজনেরও বেশী ছাত্রকে গ্রেফতার করে। এর ফলে ছাত্র আন্দোলন আরো তীব্র হয়ে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং চীনা বিপ্লবের পথ তৈরী করে দেয়। এদিকে, ১৯২০ সাল থেকে শুরু করে ১৯৩০ সালের মধ্যে চীনের শ্রমিক সমাজও সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে। এ পটভূমিতে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সাংহাইতে ছিল। অবশ্য ১৯২১ সালের মতো ১৯২৮ সালের পার্টি কংগ্রেসও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজধানী মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির বিকাশ ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলো। হুনানে এই সময় মাও সেতুং এবং মার্শাল চুতে মিলে লালফৌজ গড়ার উদ্যোগ নিলেন।

১৯২৭ সালে কোয়াংটুং এবং হুনানের কৃষকরা শস্য তোলার জন্য যে তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত হল তা থেকে মাও বিরাট প্রেরণা পেলেন। তার লাল ফৌজে কৃষকদের যোগদান দিনে দিনে বেড়েই চললো। কৃষক সভাগুলো পরিণত হতে লাগলো সৈনিক শ্রমিক ও কৃষকদের সোভিয়েতে। ১৯৩১ সালে মাওয়ের সভাপতিত্বে গঠিত হল চীনের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র। এভাবে মাও-এর নেতৃত্বে লালফৌজ দখলদার জাপানী বাহিনী এবং পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের মদদপুষ্ট চিয়াংকাই শেকের কুয়োমিনটাং সরকারের বাহিনীর বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে একের পর এক বিজয় হাসিল করতে থাকে। ২১ এপ্রিল ১৯৪৯-এ লালফৌজ তথা গণমুক্তি ফৌজ ইয়াং সি নদী পেরিয়ে উত্তর-পশ্চিম চীনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলো সমগ্র চীনকে মুক্ত করার লক্ষ্যে।

স্থানীয় কুয়োমিনটাং ফৌজ একে একে আত্মসমর্পণ করতে থাকলো। গণমুক্তি ফৌজের তিনদিনের বেশী সময় লাগলো না ইয়াংসি পেরিয়ে কুয়োমিনটাং শাসনের ২২ বছরের মূল কেন্দ্র নানকিং (বর্তমান নানজিং) দখল করতে। গণমুক্তি ফৌজ তাইওয়ান অগ্রসর হতে হতে তাইওয়ান হ্যাঙ চাও, উহান, সিয়ান, সাংহাই, লানচৌ, ক্যান্টন পেরিয়ে চেংতু পর্যন্ত একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে থাকে। এরপর মুক্ত হল হুনান, সুইয়ুয়ান, শিংকিয়াং (বর্তমান শিং জিয়াং) এবং যুনান প্রদেশ। ১৯৪৯-এর একমাত্র তিব্বত ছাড়া সমগ্র চীন। পরবর্তী সময় চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ তিব্বতও চীনের অন্তর্ভুক্ত হয়। অরুণাচল প্রদেশ ব্রিটিশ কারসাজির কারণে ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকায় সেখানে চীনা কর্তৃত্ব এখনও কায়েম হয়নি।

মাও ও তার কমরেডদের নেতৃত্বে গণমুক্তি ফৌজের অগ্রযাত্রার মুখে কুওমিনটাং নেতা এবং পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের ক্রীড়নক চিয়াংকাই শেক সদলবলে পালিয়ে ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয় নেন এবং সেখানে তাইওয়ান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। মাওসেতুং-এর নেতৃত্বে চীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করে। এ সময় চীন তৃতীয় বিশ্বের দেশের জনগণের অকৃত্রিম বন্ধুতে পরিণত হয়। মাওসেতুং পরিণত হন গোটা বিশ্বের দরিদ্র, শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের শোষণ মুক্তির সংগ্রামে প্রেরণা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্বে। পশ্চিমা লেখক এডগার স্নো এবং অ্যানালুইস্ট্রং মাওসেতুং-এর চীনের প্রশংসা করে বই লিখেছেন। মাও-এর চীন গোটা বিশ্বে শান্তি ও মৈত্রীর বাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন।

'পিংপং ডিপ্লোমেসি'র মাধ্যমে বিশ্বের দেশে দেশে মৈত্রীর বন্ধন গড়ে তোলা হয়। 'আগে বন্ধুত্ব, তারপর খেলা' এটি ছিল চীনাদের একটি প্রিয় শ্লোগান। তারপরও চীনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। চীনের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অপপ্রচার জোরদার করা হয়। মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং গ্রেট লীপ ফরোয়ার্ড সম্পর্কে পশ্চিমা গণমাধ্যমে ব্যাপক মিথ্যা প্রচার চালানো হয়। এদিকে, ৬০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের আদর্শচ্যুতি ঘটে। দেশটির সংশোধনবাদী নেতৃত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নকে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত করে। এ সময় চীনে সামরিক সহায়তা দান এবং আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেয়। সেই সাথে প্রত্যাহার করে নেয়া হয় সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের। তৃতীয় বিশ্বের দেশ পাকিস্তান এ সময় চীনের পাশে দাঁড়িয়েছিল।

যে কারণে চীন ১৯৬৫ সাল থেকে সম্প্রসারণবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিটি যুদ্ধে পাকিস্তানের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে। শত প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে চীন তার নিজস্ব প্রয়াসে পারমাণবিক এবং হাইড্রোজেন বোমার অধিকারী হয়ে বিশ্ব শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় মাওসেতুং-এর জামানায়। এক পর্যায়ে চীন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে তার বৈধভাবে প্রাপ্য স্থায়ী আসন আদায় করতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে পাকিস্তান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। যাহোক, মাওসেতুং-এর নেতৃত্ব চীন ১৯৪৯-এর পূর্ববর্তী সময়ের দারিদ্র্য ও বুভুক্ষ থেকে মুক্ত হতে শুরু করে। চীনের দুঃখ বলে পরিচিত হোয়াংহো এবং ইয়াংসি নদীতে বাঁধ দিয়ে ভয়াবহ বন্যার মোকাবিলা করে কৃষি ফলন বৃদ্ধি করা হয়।

বিপ্লব পরবর্তী চীনে শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও ব্যাপক উন্নতি ঘটে। বেকার সমস্যা বহুলাংশে দূরীভূত হয়। তা সত্ত্বেও দারিদ্র্য সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব হয়নি। মাওসেতুং-এর মহাপ্রয়াণের পর দেং জিয়াও ঝিং-এর জামানায় চীন এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে। এ সময় রাষ্ট্র ও সরকারের ওপর কমিউনিস্ট পার্টির আগের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করা হয়। 'বিড়াল সাদা না কালো তা বিবেচনা না করে ইঁদুর মারতে পারে কিনা সেটিই দেখতে হবে' অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইস্যুতে প্রয়াত দেং জিয়াও বিং-এর এ মন্তব্যটি বিতর্কের জন্ম দিলেও বর্তমান চীনের ব্যাপক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে তা নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য হচ্ছে না। বরং একথা সত্যি যে, নেপোলিয়নের বর্ণিত ঘুমন্ত সিংহ চীন আজ জাগ্রত সিংহে রূপান্তরিত হয়ে মহাগর্জন তুলে বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

চীন শুধু এখন বিশ্বের তৃতীয় অর্থনৈতিক শক্তিই নয়, ভবিষ্যৎ পরাশক্তিও বটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রিক এক মেরুর বিশ্বব্যবস্থার অবসান যে গণচীনই ঘটাতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের প্রায় সবাই একমত। এই মুহূর্তে চীনের ঈর্ষণীয় অর্থনৈতিক সাফল্য গোটা বিশ্বে ব্যাপক চমক সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি সমাপ্ত পূর্ণ সফল বেইজিং অলিম্পিকের মাধ্যমে চীনের বিশাল আর্থিক সমৃদ্ধিই প্রতিফলিত হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ আর্থিক মন্দা সত্ত্বেও চীনের প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশের নিচে নামেনি। অব্যাহত রয়েছে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিও। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, চীনের মাথাপিছু আয় ১৯৭৮ সালের ১৪৭ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০০৮ সালে ৩ হাজার ৩৭০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

বিশ্বের মাত্র ৭ ভাগ আবাদযোগ্য জমি দিয়ে গণচীন এখন বিশ্বের ২২ ভাগ মানুষের খাদ্য যোগানদাতা। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্যের উন্নতির পাশাপাশি ভোগ্যপণ্যেরও বিশাল আভ্যন্তরীণ বাজার গড়ে উঠেছে চীনে। শুধু অর্থনৈতিক নয়, খেলাধুলার জগতেও চীন এখন অন্যতম পরাশক্তি। চীনের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ঘটছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সংগতি রক্ষা করে। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২ কোটিরও বেশী। টিভি, ল্যান্ড ফোন ও মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর হার এখন ৭০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে সেখানে। বিশ্বের সবচে বেশী বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের অধিকারী দেশ হল চীন।

এরই প্রেক্ষিতে খোদ বিশ্বব্যাংক গণচীনকে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বৃহত্তম সাফল্যের নজির বলে আখ্যায়িত করেছে। পশ্চিমা পণ্ডিত এবং বিশেষজ্ঞরাও এখন অকপটে একথা স্বীকার করছেন যে, বিগত ৩০ বছরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চীনের উত্থান ঐতিহাসিক এবং নজিরবিহীন। শুধু অর্থনৈতিক সাফল্যই নয়, মাও পরবর্তী চীনা নেতৃত্ব আর্থিক উদারীকরণের কৌশল অবলম্বন তথা 'এক দেশ দুই অর্থনীতি'র প্রতিশ্রুতি দিয়ে চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হংকং এবং ম্যাকাওকে চীনের সঙ্গে পুনরেকত্রীকরণ করেছেন। তাইওয়ানের সাথেও পুনরেকত্রীকরণের প্রক্রিয়া চলছে। তারপরও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার কিছু এশীয় মিত্রদের সহায়তায়

চীনের অখণ্ডতা নাশের অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

৬০-এর দশক থেকে ভারতে অবস্থানরত সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী দালাইলামাকে দিয়ে তিব্বতকে বিচ্ছিন্ন করার যে হীন প্রয়াস চালানো হচ্ছে তা এখনো অব্যাহত আছে। শিং জিংয়াং-এও পশ্চিমা বিশ্বে অবস্থানরত সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী নেত্রী রাবিয়া কাদিরসহ অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদীদের লেলিয়ে দিয়ে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। সুখের বিষয় হলো শিং জিয়াং-এর বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মুসলিম জাহানের কোনো সমর্থন পায়নি। এই ইস্যুতে মুসলিম জাহানের বেশীর ভাগ দেশ চীনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারী শিংজিয়াং-এর বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করে চীনের আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছেন।

যাহোক, একথাও স্বীকার করতে হবে যে, ঐক্যবদ্ধ সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী চীন বাংলাদেশের সামগ্রিক স্বার্থেরও অনুকূল বলে বিবেচিত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময় চীন ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের যে উন্নতি ঘটে তা এখনও অব্যাহত রয়েছে। চীন এবং বাংলাদেশের মৈত্রী ও বন্ধুত্ব সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ’৭০-এর দশকে সম্প্রসারণবাদী একটি দেশের বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সামরিক আগ্রাসন চালানোর উদ্যোগ ভেস্তে যায় চীনের দৃঢ় ভূমিকার কারণে। বাংলাদেশে আজ যে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে উঠেছে সেক্ষেত্রে চীনের বিশাল অবদান অনস্বীকার্য। অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উন্নয়নে চীনের সাহায্য ও সহযোগিতার কথা সকল বাংলাদেশীর কমবেশী জানা আছে। বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুটি চীনা সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের একটি অনন্য নজির হয়ে আছে। চীন স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সহযোগী বন্ধু।

এদিকে, স্বাধীনতার ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তিয়েনআনমেন স্কোয়ারে সামরিক কুচকাওয়াজের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভীরে আঘাত হানতে সক্ষম পরমাণু অস্ত্রবাহী দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রসহ অন্যান্য অত্যাধুনিক যেসব সমরাস্ত্র প্রদর্শিত হয়েছে সেগুলোর বেশীর ভাগই চীনে নির্মিত। এর মাধ্যমে সমর প্রযুক্তির ক্ষেত্রে চীনের সক্ষমতাই প্রতিফলিত হয়েছে। সেই সাথে এ সত্যটিও উন্মোচিত হয়েছে যে, আগামী দিনের অপর একটি পরাশক্তি হতে চলেছে চীন। সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী চীন তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পারবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সমাজতন্ত্র এক্ষেত্রে প্রধান সহায়কের ভূমিকা পালন করছে। তবে চূড়ান্ত বিচারে প্রেসিডেন্ট হু জিনতাওয়ের ‘সমাজতন্ত্রই পারে চীনকে রক্ষা করতে’ কথাটি ইতিহাসের কষ্টিপাথরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আর সমাজতান্ত্রিক শক্তিশালী চীন বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্যও সহায়ক হতে পারে।

❏ লেখক : কলেজ শিক্ষক ও কলামিস্ট